এবারের নোবেল শান্তি পুরস্কার : একটি নোট অব ডিসেন্ট-২

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আগে আরেক বাঙালি নোবেল পুরস্কার পান। তিনি ড. অমর্ত্য সেন। তিনি পুরস্কারটি পান অর্থনীতিতে। অর্থনীতি শাস্ত্রে তিনি সত্যই একজন মৌলিক চিন্তাবিদ এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী। কিন্তু তাকেও নোবেল পুরস্কারের বর্তমান 'ধনবাদী অভিভাবকেরা' নিজস্ব বিচার-বিবেচনা ছাড়া পুরস্কারটি দেননি। তাকে অবশ্য অর্থনৈতিক বিষয়ে মৌলিক গবেষণার জন্য পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে। এই গবেষণা ইউরোপ-আমেরিকায় ক্যাপিটালিস্ট মুঘলদের খুব খুশি করেছিল।

কারণ, চীনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর যেসব ছোট-বড় দুর্ভিক্ষ হয়েছে, তার মূল দায় ড. অমর্ত্য সেন চীনে পশ্চিমা গণতন্ত্র ও সেই গণতান্ত্রিক কমিউনিকেশন ব্যবস্থার অনুপস্থিতির ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। প্রকারান্তরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। অন্যদিকে অবিভক্ত বাংলাদেশে ব্রিটিশ শাসনের সূচনায় ১২৭৬ সালের মন্বন্তর (বঙ্কিমের আনন্দমঠে বর্ণিত), ব্রিটিশ শাসনের স্বর্ণযুগে ১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষের পেছনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লিপ্ত ব্রিটিশ ক্যাপিটালিজম ও ইমপেরিয়ালিজমের প্রত্যক্ষ হাত থাকার কথাটি তিনি এড়িয়ে গেছেন।

অথচ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনেক কর্মকর্তা, এমনকি তাদের উচ্চপদস্থ ভারতীয় সিভিল সার্ভেন্টদের অনেকেই (যেমন ভাইসরয় কাউন্সিলের সদস্য শ্রী জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব) পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের পরপরই স্বীকার করেছেন, এটা মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ (সধহ সধফব ভধসরহব) ব্রিটিশ শাসকদের যুদ্ধবাদী স্বার্থেই এই দুর্ভিক্ষ ঘটানো হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে মুজিব সরকারকে উৎখাতের জন্য বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর নেতা আমেরিকা একইভাবে একটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির চক্রান্তে সফল হয়েছিল। ১৯৭৬ সালেই আমেরিকার বিখ্যাত 'ফরেইন অ্যাফেয়ার্স' কাগজের একটি সংখ্যায় 'ফুড এজ উইপন' (অস্ত্র হিসেবে খাদ্য) শীর্ষক প্রবন্ধে তা স্বীকার করা হয়েছে। দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদ ও ধনবাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা ড. অমর্ত্য সেনের 'মৌলিক অর্থনৈতিক গবেষণায়' প্রায় অনুপস্থিত। ড. অমর্ত্য সেন অর্থনীতি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরপরই লন্ডনের এক বামঘেঁষা অর্থনীতিবিদ একটি নিবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, 'এককালে নোবেল পুরস্কারদাতা সুইডিশ

কমিটি ছিল ব্রিটিশ বিগ বিজনেস দ্বারা প্রভাবিত। এখন মার্কিন ও মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর ডিরেক্টর বোর্ডের ই”ছা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে যে দুর্ভিক্ষ, শোষণ ও বঞ্চনা লেগেই আছে তার মূল কারণ যে সাম্রাজ্যবাদ ও ধনবাদের চক্রান্ত ও শোষণ নয়, বরং সমাজবাদী ব্যবস্থায় অগণতান্ত্রিকতা এজন্য মূলত দায়ী; একথা চীনের উদাহরণ টেনে তৃতীয় বিশ্বের একজন অর্থনীতিবিদের দ্বারা বলানো গ্লোবাল ক্যাপিটালিস্টদের প্রয়োজন ছিল। অমর্ত্য সেন যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তার পেছনে এও একটা বড় কারণ। আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুর পর (নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তক) বহু বছর পুরস্কারটি ছিল প্রকৃতপক্ষেই আন্তর্জাতিক মানের। প্রকৃত গুণীজনরাই এটি পেতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই পুরস্কারটি স্নায়ুযুদ্ধের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে ওঠে। বর্তমানে স্নায়ুযুদ্ধ নেই; কিন্তু অস্ত্রটির প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার রয়ে গেছে।’ ড. অমর্ত্য সেনের কথা থাক। আদি এবং বর্তমানের নোবেল পুরস্কারের চরিত্রের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য ঘটে গেছে, তা দেখানোর জন্যই তাকে এ আলোচনায় টেনে আনতে হলো। এজন্য আমি দুঃখিত। অমর্ত্য সেনকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি। তার প্রথম স্ত্রী নবণীতা দেব সেনের সঙ্গেও আমার এক সময় যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। বর্তমানে তেমন যোগাযোগ নেই। প্রায় বছর দুই আগে যখন রবীতীর্থ শান্তিনিকেতনে যাই, তখনো অমর্ত্য সেনের মা বেঁচে আছেন। তাকে প্রণাম জানাতে তার বাড়িতে গিয়েছিলাম। অমর্ত্য সেন সম্প্রতি লন্ডনে বাঙালিদের এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে মঞ্চে বসার ও বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। আমার বক্তৃতায় ড. সেনের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কিত অর্থনৈতিক থিওরিটি সম্পর্কে আমার অভিযোগ প্র”ছন্নভাবে তুলে ধরেছিলাম। তিনি তাতে খুশি হননি। তার তর“ণী মেয়ে সঙ্গেই ছিল। চা পানের অবসর মুহূর্তে সে আমার কাছে ছুটে এসে বলেছে, ‘ আঙ্কল, আপনার বক্তৃতায় নবণীতা দেব সেনের কথা বলেছেন। আমি তার মেয়ে।’ তার মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করেছি। বাংলাদেশ (অবিভক্ত) যেমন প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়েছে সাহিত্যে (রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩), এবারো যদি সেই সাহিত্যে পুরস্কারটি পেত, তাহলে ব্যক্তিগতভাবে খুবই খুশি হতাম। বলতে দ্বিধা নেই, তাকে বলা যেত বাঙালি বা বাংলাদেশের প্রকৃত একটি অর্জন। যে অর্জন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নোবেল সাহিত্য পুরস্কার পাওয়ার সময়ের মতো দুই বাংলার প্রতিটি বাঙালি গৌরব ও গর্ববোধ করতে পারে। দুই বাংলাতেই নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মতো সাহিত্য কি রচিত হয়নি? প্রচুর হয়েছে। হেমিংওয়ে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর প্রশ্ন উঠেছিল, তার ‘ওল্ডম্যান এন্ড দা সী’– এর চাইতে অনেক সমৃদ্ধ উপন্যাস কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ নয়? তার ‘ফর হুম দা বেল টেলস’ বা ‘স্টেজ অব ক্লিমেনজেরোর’ চাইতে অনেক বেশি সফল মানবতাবাদী ও প্রকৃতিবাদী উপন্যাস কি নয় তারাশঙ্করের ‘ধাত্রী দেবতা’, বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালি’ বা ‘আরণ্যক’ নয়? তাহলে তাদের নামটা একবারও নোবেল প্রাইজ পাওয়ার জন্য

বিবেচিত হয়নি কেন?

প্রশ্নটা তখনই তুলেছিলেন কলকাতার কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক। তারা বলেছিলেন, কেবল কি ভাষাই বাঙালিদের সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার অন্তরায়? তাহলে সেই ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষায় 'গীতাঞ্জলি' লিখে নোবেল পুরস্কার পেলেন কী করে? কেবল কি অনুবাদের জোরে? এই প্রশ্নের জবাব সুইডিশ একাডেমী থেকে পাওয়া যায়নি। এখনো দুই বাংলাতে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মতো সাহিত্য রচিত হচ্ছে না, তা নয়। কিন্তু নোবেল পুরস্কারের চরিত্র ও উদ্দেশ্য বদল হয়ে যাওয়ার জন্য তা দেওয়ার ব্যাপারে এখন রাজনৈতিক বিবেচনাই প্রাধান্য পাচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব থাকাকালে যে রুশ লেখক বোরিস প্যাস্টারনেককে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে; তার 'ড. জিভাগো' বা পরবর্তীকালের সোলজেনিতসিনের 'ক্যান্সার ওয়ার্ড' (ইনি তথ্যভিত্তিক কাল্পনিক গুলাগ বইটি লিখেও পশ্চিমা বিশ্বে যথেষ্ট আদৃত ও প্রশংসিত হয়েছিলেন) বই দুটি তাদের সাহিত্য মহত্ত্বের জন্য, না ধনবাদী পশ্চিমা বিশ্বের প্রোপাগান্ডার ও স্নায়ুযুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল, এই প্রশ্ন নিয়ে তো এত দীর্ঘকাল পর প্রশ্ন তোলাও হাস্যকর। এ বই দুটি নিয়ে বিশ্বময় হৈচৈ সৃষ্টির জন্য মার্কিন সিআইএ তাদের গোপন সাহায্যপুষ্ট কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডম, পেন ও অন্যান্য তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সংস্থার মাধ্যমে কী বিপুল অর্থ বিশ্বময় ছড়িয়েছিল তা তো এখন ইতিহাস। ড. আবদুল মালেক, যিনি বর্তমানে কানাডার কুইবেকে বসবাসরত ও গবেষণাকার্যে লিপ্ত এবং দীর্ঘকাল আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন (বঙ্গবন্ধুর মোনায়েম সরকারের ইমিডিয়েট বড় ভাই), তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নাল এপিরনে (অঢ়বরৎড়হ) ড. ইউনূসের নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখেছেন। এই নিবন্ধ সম্পর্কে এক পত্রলেখকের জিজ্ঞাসার জবাব তিনি ওই জার্নালেই দিয়েছেন : "Most of the recent Nobel Awards show to what extent the conservative, rightwing and bigoted agenda of monopoly capitalism has infected the Nobel Awards. A very good friend of mine who was an ex-Belgian diplomat in Dhaka told me that he and an Aid Agency lady from Sweden were so mad at him (Dr. Yunus) that they just hated him. But he said he knew the inner machination and predicted many years ago, that Yunus will one day be rewarded with a Nobel Prize- and it came true. Dr. Yunus is a charlatan who has opened a charity (Grameen Bank) in Bangladesh Legging aid donation from

the west. Major part of this ‘aid’ money goes to his personal coffers. This is an attempt by monopoly capitalism to pacify the semi feudal/ neo-colonial society in Bangladesh and to keep it safe from radicalization and revolution, with false hope of aid and development through its agents. They are trying to expert this ‘successful’ model of Grameen Bank to Latin America.”

মোদ্দাকথায় এর অর্থ হলো ‘সাম্প্রতিক নোবেল প্রাইজগুলোর অধিকাংশই রক্ষণশীল, ডানপন্থি এবং মনোপলি ক্যাপিটালিজমের দ্বারা দূষিত হয়ে পড়েছে। আমার একজন বন্ধু, যিনি ঢাকায় বেলজিয়ামের একজন কূটনীতিক ছিলেন, আমাকে বলেছেন, তিনি এবং এইড-এজেন্সির এক মহিলা ড. ইউনূসকে রীতিমতো ঘৃণা করেন। তবে তিনি নোবেল প্রাইজ বণ্টনের ভেতরের কথা জানেন এবং বহু বছর আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ইউনূস নোবেল প্রাইজ পাবেন। সে কথা সত্য হয়েছে। ড. ইউনূস বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংক নামে চ্যারিটি খুলে পশ্চিমা দেশে সাহায্য ভিক্ষা শুরু করেন, যার অধিকাংশ তার নিজের থলিতে গেছে। বাংলাদেশে ফিউডাল ও নিও-কলোনিয়াল সমাজকে সাহায্য ও উন্নয়নের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তুষ্ট রাখার জন্যই একচেটিয়া পুঁজিবাদের এই চক্রান্ত। তারা চায় এই সমাজ যাতে বিপ্লব ও পরিবর্তনের পথে না এগোয়।’ গ্রামীণ ব্যাংক যে কোনো মৌলিক অর্থনৈতিক গবেষণার ফসল নয় এবং বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে তা কোনো রূপান্তর ঘটাতে পারেনি, একথা জেনেই নোবেল পুরস্কার দান কমিটির নেপথ্যের অভিভাবকরা অর্থনীতিতে ড. ইউনূসকে পুরস্কারটি দিতে সাহস করেননি। এ জন্যই শান্তি পুরস্কারের আড়ালে তাকে পুরস্কৃত করা। নোবেল সাহিত্য পুরস্কারের চেয়েও শান্তি পুরস্কারটিকেই সাম্রাজ্যবাদী ও ধনবাদী পশ্চিমা গোষ্ঠী প্রথমে তাদের স্নায়ুযুদ্ধের এবং বর্তমানে তাদের আধিপত্যবাদী নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের অধিক শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। যদিও বাংলাদেশের ভুক্তভোগী গ্রামীণ জনগোষ্ঠী জানে, বিশাল গ্রামবাংলায় শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়নে এই গ্রামীণ প্রকল্পটির অবদান খুবই সীমিত।

ড. ইউনূস তার নিজের জেলা চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকায় দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে যে অশান্তি ও রক্তপাত চলেছে, সে সম্পর্কে একবারও মুখ খোলেননি, কিংবা সেখানে কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় তা নিয়েও মাথা ঘামাননি। কিংবা ভারতের ফারাক্কা বাঁধের ফলে উত্তরবঙ্গে পানির অভাবে নদীর নাব্যতা নষ্ট হয়ে এবং জলসেচের অভাবে জমির ফসল ধ্বংস হয়ে পৌনঃপুনিক ‘মঙ্গায়’ লাখ লাখ মানুষের দুর্ভোগের প্রতিকারকল্পে তার আন্তর্জাতিক মুরব্বিদের সাহায্যে দেশটিতে শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনারও কোনো প্রকল্প হাতে নেননি। এ ধরনের প্রকল্প

নিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনাও করেননি। তিনি গ্রামের মানুষের দারিদ্র্য নিয়ে স্বল্পঋণ ও বিস্তর সুদের ব্যবসা করেছেন। তাহলে তিনি কী জন্য শান্তি পুরস্কার পেলেন? আমার তো মনে হয়, পার্বত্য শান্তি চুক্তি দ্বারা চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নেওয়া এবং ভারতের সঙ্গে একটি ৩০ বছর মেয়াদি পানি চুক্তি করার ব্যাপারে সাফল্য অর্জনের জন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারই নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল। তার অসংখ্য ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের আমরা সমালোচনা করতে পারি, কিন্তু নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যদি কারো দাবি থাকে সে দাবি অবশ্যই শেখ হাসিনার।

গত কয়েক দশক ধরে যাদের নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, তাদের নামের তালিকা দেখলেই কী ধরনের লোক এ পুরস্কার পেয়েছেন এবং এ পুরস্কার দেওয়ার উদ্দেশ্য কী ছিল তা পরিষ্কার বোঝা যায়। নোবেল শান্তি পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে এমন সব ব্যক্তিকে যারা শান্তির বদলে বিশ্বে অশান্তি সৃষ্টি করেছেন, যুদ্ধ ও গণহত্যার সঙ্গে জড়িত এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের হোতা অথবা তার ক্রীড়নক হিসেবে পরিচিত ছিলেন বা আছেন। দু'একজন শান্তিবাদী মানুষকে যে পুরস্কারটি দেওয়া হয়নি, তা নয়। তা ছিল আই ওয়াশ বা বিশ্বের মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা। যেমন মাদার তেরেসা, লি ডুস থো (Le Duc Tho), বিশপ ডেসমন্ড টুটু, দালাইলামা প্রমুখ। বাকি অধিকাংশকেই সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়নক আখ্যা দেওয়া যায়। এদের তালিকার শীর্ষে আছেন পৃথিবীর বিভিন্ন যুদ্ধ, রক্তপাত ও অশান্তি সৃষ্টির হোতা হেনরি কিসিঞ্জার, বাংলাদেশে ত্রিশ লাখ নরনারীকে হত্যার জন্য যিনি ছিলেন পাকিস্তানের হানাদারদের প্রধান মদদদাতা। বর্তমান ইরাক যুদ্ধে যিনি প্রেসিডেন্ট বুশের প্রধান মন্ত্রণাদাতা। এই রক্তপিপাসু দানবকে দেওয়া হয়েছে নোবেল শান্তি পুরস্কার। গর্বাচভ যিনি রিগ্যান, থ্যাচারের ক্রীড়নক সেজে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে ভেঙে বিশ্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের পথ করে দিয়েছেন এবং তৃতীয় বিশ্বে সোভিয়েতের মিত্র বলে পরিচিত দেশগুলোর সঙ্গে (যেমন ইরাক) বিশ্বাসঘাতকতা করতে কিছুমাত্র বিবেকপীড়া বোধ করেননি, তাকেও ভূষিত করা হয়েছে নোবেল শান্তি পুরস্কারে। সন্ত্রাসী দস্যু হিসেবে কুখ্যাত এবং পরবর্তীকালে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হয়েছিলেন সেই মেনাহিম বেগিনকেও দেওয়া হয়েছিল নোবেল শান্তি পুরস্কার। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্বর শ্বেতাঙ্গ প্রেসিডেন্ট ক্লার্কও শান্তিবাদী হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন। তালিকা লম্বা করতে চাই না। এসব 'মহান শান্তিবাদী'রই নামের তালিকায় এবার যুক্ত হলেন ড. ইউনূস। সুতরাং বাংলাদেশের মানুষের গর্বে ও আনন্দে দশ ফুট লম্বা না হয়ে উপায় আছে?

কিন্তু এ তথাকথিত শান্তি পুরস্কারের ফাঁদে পা দিতে রাজি হননি এমন চরিত্রবান ও শান্তিবাদী মানুষও পৃথিবীতে আছেন। তাদের একজন উত্তর ভিয়েতনামের লি ডুস থো। ভিয়েতনাম যুদ্ধে পরাজিত মার্কিন যুদ্ধবাজের দল যখন স্বদেশে পলায়নের আগে বিজয়ী ভিয়েৎকঙদের কাছে একটি শান্তিচুক্তি ভিক্ষা করছিল, তখন হো চিন মিন বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রধান নেগোসিয়েটর ছিলেন লি ডুস থো। ১৯৭৩ সালে কিসিঞ্জারের সঙ্গে যুক্তভাবে তাকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। তিনি ঘৃণার সঙ্গে তা ফিরিয়ে দেন। তিনি কিসিঞ্জারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শান্তি পুরস্কার নিতে চাননি। তাছাড়া স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ও সু পড়ঁহঃৎু হড়ঃ ুবঃ ধঃ ঢ়বধপব 'আমার দেশে এখনো শান্তি আসেনি, আমি কী করে শান্তি পুরস্কার নিই?'

এটা হচ্ছে বিবেক ও বিশ্বাসের কথা। বাংলাদেশে এটা কি আছে? যে বাংলাদেশ এখনো কিছুমাত্র শান্তির মুখ দেখেনি, সর্বত্র সন্ত্রাসী হামলা অব্যাহত রয়েছে, ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা, আহসান উল্লাহ মাস্টার, শাহ কিবরিয়া, আইভি রহমান ও হুমায়ুন আজাদসহ অসংখ্য বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সাহিত্যিকের হত্যাকাণ্ডের কোনো বিচার ও প্রতিকার হয়নি, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার অনুষ্ঠানে বিচারকরা বিব্রত বোধ করেন, বাংলা ভাই, শায়খ রহমানের মতো দুর্ধর্ষ জঙ্গি নেতারা নজরবন্দি হওয়ার নামে সরকারি অতিথি হিসেবে আরাম-আয়েশে দিন কাটাচ্ছে, সেই দেশে ড. ইউনূস 'শান্তির দূত' হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং নোবেল শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করে অশান্তি-পীড়িত জাতিকে দশ হাত বুকের ছাতি ফুলানোর পরামর্শ দিচ্ছেন! সত্যই সেলুকাস, এটা শুধু বাংলাদেশেই সম্ভব।

সন্দেহ নেই, ড. ইউনূসকে একটি চমৎকার সময়ে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। অপশাসন, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্য, বিদ্যুৎ ও পানি সংকটের জন্য দেশটি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছিল। সংলাপের নামে দীর্ঘসূত্রতা, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অরাজকতা দেশটিতে একটি গণঅভ্যুত্থানের জমি প্রস্তুত করছিল। ঠিক সেই সময় ঘোষিত হলো, বাংলাদেশ নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছে। ২০০৫ সালেই তো এ পুরস্কার দেওয়ার কথা উঠেছিল। তখন তো দেওয়া হয়নি। হয়তো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল বর্তমান বছরের জন্য, যাতে একটি সম্ভাব্য গণঅভ্যুত্থানের প্রচণ্ড আঘাত থেকে জোট সরকারকে রক্ষা করা যায়, বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী জনগণের দৃষ্টি আসল ইস্যুগুলো থেকে সরিয়ে নিয়ে নকল আশা ও নকল গর্বে ভরে তোলা যায়, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রস্তুতিকে বানচাল করে দেওয়া যায় এবং বাংলাদেশের রাজনীতিকে নব্য সাম্রাজ্যবাদী ও ধনবাদী ব্যবস্থার অবক্ষয়প্রাপ্ত কাঠামোর মধ্যে আরো বহুদিন বন্দি করে রাখা যায়। সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের পোষা মৌলবাদী সন্ত্রাসকেও তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সুযোগ

দেওয়া যায়।

নোবেল শান্স্নি পুরস্ষ্কার পাওয়ার তুমুল ঢক্কানিনাদের মধ্যে কিছু বিচক্ষণতা, কিছু বাস্টস্নবতার কথা শোনা যা"ছে দু'একজন প্রাজ্ঞ দহ্নরদর্শী মানুষের মুখ থেকে। সুদহ্নর অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত এক বাঙালি শিক্ষাবিদ (নাম প্রকাশ করার অনুমতি নিইনি) টেলিফোনে আমাকে বলেছেন, দেশ এত বড় সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে। এতগুলো রাজনৈতিক হত্যাকা- হয়েছে দেশে, সমস্যা সংকটে জনজীবন দিশেহারা। তখন গত পাঁচ বছর ধরে নিশ্চুপ থেকে, একটি কথা না বলে ড. ইউনহ্নস হঠাৎ কেমন করে মহাত্রাতার বেশে আবির্ভূত হয়ে দেশকে শান্স্নির বাণী শোনান? রাজনৈতিক দল করার ঘোষণা দেন? সেই রাজনৈতিক দলে কারা আসবে? তার লক্ষ্য হবে কী? দেশের যে রাজনীতিকে তিনি এত দিন অবজ্ঞা দেখিয়ে এসেছেন, রাজনীতিকরা অযোগ্য ও দেশ শাসনে ব্যর্থ বলে প্র"ছন্নভাবে প্রচার চালিয়েছেন, এখন সেই রাজনীতিকদের দলেই নাম লেখাতে চা"ছেন কেন? বাংলাদেশের রাজনীতি নাকি অপবিত্র! তার 'পহ্নত স্¯র্শ' পেলেই কি তা পবিত্র হয়ে উঠবে? জাদুমন্স্নে দেশের মানুষের সব সমস্যা দহ্নর হয়ে যাবে?

প্রচার-প্রপাগা-ার জোরে কী না হয়? ব্রাহ্মণের কাঁধের ছাগশিশু কুকুরশাবক হয়ে গিয়েছিল। প্রয়োজনে কুকুরশাবককেও ছাগশিশু বলে প্রমাণ করা যায়। দু'দিন আগেও ড. ইউনহ্নস যেখানে তার বহু ঢক্কানিনাদিত সুশীল সমাজ নিয়ে সামনে এগোতে পারেননি, তিনি নিজেও ছিলেন বিতর্কিত ব্যক্তি, একটি শান্স্নি পুরস্ষ্কারের স্¯র্শমণির স্¯র্শে তিনি রাতারাতি বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অবিতর্কিত প্রধান হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছেন প্রধান দুটি দলেরই অনেক নেতার কাছে। পশ্চিমা শক্তিগুলো বিশেষ করে আমেরিকা সম্ভবত এটাই চেয়েছিল। কিন্তু শান্স্নি পুরস্ষ্কার পাওয়ার পর দেশময় আবেগ-উ"ছ্বাসের ঢেউ দেখে তার চোখে হয়তো নতুন স্ট্বপ্ন নেমেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অস্ট্থায়ী প্রধান হওয়ার চেয়ে স্ট্থায়ী কিছু ভাবছেন। হয়তো ভাবছেন, দেশব্যাপী এই ইউফোরিয়াকে মহ্নলধন করে তিনি তার মুরব্বিদের সাহায্যে গোটা দেশটাকেই দীর্ঘকালের জন্য হাতের মুঠোয় নিতে পারবেন। যদি তা হয় তাহলে খুব ভালো কথা। ইউনহ্নস সাহেব তাড়াতাড়ি দয়া করে রাজনীতিতে নেমে পড়ুন, নিজের দল গড়ুন। একটি বাংলা, একটি ইংরেজি দুটি শক্তিশালী প্রচারমাধ্যম তার হাতের মুঠোয়। আছে সিপিডি ও শিক্ষিত এলিট শ্রেণীর সমর্থন। আছে নিজের গ্রামীণ ব্যাংক, গ্রামীণফোন এবং আরো কয়েকটি শক্তিশালী এনজিওর পৃষ্ঠপোষকতা। আছে বিদেশী পেট্রোনাইজেশন। আছে অঢেল অর্থ ও গ্রামীণ ব্যবসায়ের অবিশ্বাস্য মুনাফা। তিনি রাজনীতিতে নামলে ভয়টা কি? দয়া করে

নামুন ও দল গড়ুন। তাহলে আমরা বাঁচি, তিনিও বাঁচুন। তাকে আশ্বাস দিয়ে বলতে পারি, তিনি নতুন রাজনৈতিক দল গড়লে আর কোনো দলের তেমন কিছু না হোক, বিএনপিতে ভূমিকম্প শুরু হবে। দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে অতৃপ্ত, অসন্তুষ্ট নেতা-কর্মী তার দলে এসে জুটবে। চাই কি, ড. বি. চৌধুরী, কর্নেল (অব.) অলির দলও তার সঙ্গে এসে মিশে যেতে আগ্রহী হতে পারেন। বিএনপির দু'একজন নেতার সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তারা বিএনপির ভাবাদর্শের সঙ্গে ড. ইউনূসের খুব একটা অমিল আছে বলে মনে করেন না। এই অসন্তুষ্ট নেতা-কর্মীর দল হাওয়া ভবনের দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচতে চায়। ড. ইউনূস নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মান্নান ভূঁইয়া, হারিছ চৌধুরী অভিনন্দন জানানোর নাম করে দৌড়ে এসে তার গলা ধরে যেভাবে ঝুলে পড়েছিলেন, তা থেকেও ড. ইউনূস কি আলামত কিছু বুঝছেন না? সে জন্যই বলছি, দোহাই লাগে নোবেল লরিয়েট, তাড়াতাড়ি নতুন রাজনৈতিক দল করুন। নিজে বাঁচুন, পরাধীনদেরও বাঁচান। ড. ইউনূসের নোবেল পুরস্কারজয়ী গ্রামীণ ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন করে আর কিছু লিখতে চাই না। এটা ড. ইউনূসের নতুন কোনো আবিষ্কার নয়, আগেই বলেছি। এ প্রথা ব্রিটিশ আমলেও ছিল। নাম ছিল মহাজনী প্রথা। মহাজন নামে কুখ্যাত বড় বড় ব্যবসায়ী গরিব মানুষকে সুদে কিছু টাকা ঋণ দিয়ে পরে চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে ফেলে তাদের ঘরবাড়ি গ্রাস করত। যারা বলেন, গ্রামীণ ব্যাংক অনেক মানুষের উপকার করেছে, তাদের বলব, এককালে অভিশপ্ত মহাজনী প্রথা থেকেও কিছু গরিব মানুষ উপকৃত হয়েছে। ছেলের খৎনা, মেয়ের বিয়ে এবং এ ধরনের সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে কোনো গরিব পরিবার অর্থাভাবে যখন চোখে অন্ধকার দেখত, তখন অন্যন্যোপায় হয়ে এ মহাজনদের শরণাপন্ন হতো। তাতে সাময়িকভাবে তাদের সমস্যারও সমাধান হতো।

তারপর শুরু হতো মাকড়সার জালের মতো চক্রবৃদ্ধি সুদের জালে ভয়াবহভাবে তাদের জড়িয়ে পড়া এবং সর্বস্ব হারিয়ে কাঙাল হয়ে যাওয়া। এই মহাজনী প্রথার শোষণে যখন গ্রামবাংলা শ্মশান হতে বসেছিল, তখন ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গ্রামবাংলার মানুষ এবং দরিদ্র কৃষককে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসেন এবং আইন করে মহাজনী প্রথা রদ করেন। এটা ব্রিটিশ আমলের কথা। পাকিস্তানি আমলে বাংলাদেশে সুদখোর কাবুলিওয়ালাদের অত্যাচার চরমে পৌঁছেছিল। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় এই কাবুলিওয়ালারা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ায় দেশ এ অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়।

ব্রিটিশ আমলের মহাজনী প্রথা, পাকিস্তান আমলের কাবুলি দেনাই স্বাধীন বাংলাদেশে নতুন ও

শোভন রূপের আ"ছাদনে গ্রামীণ ব্যাংকের চেহারায় আত্মপ্রকাশ করেছে– একথা কেউ বলতে চাইলে তাকে কি দোষ দেওয়া যাবে? গ্রাম্য মহাজন বা শহুরে কাবুলিওয়ালাদের পেছনে সরকারি মদদ ও বিদেশী এইড এজেন্সির অঢেল অর্থ সাহায্য ছিল না। ছিল না বিদেশী শাসক ও শোষক শক্তির উদ্দেশ্যপরায়ণ পৃষ্ঠপোষকতা। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংক, গ্রামীণফোন এবং ড. ইউনহ্সের পেছনে সবই আছে। তিনি এখন মহাশক্তিধর। নোবেল পিস প্রাইজ তার এ শক্তিকে এখন তুঙ্গে তুলেছে। কিন্তু দেশময় এই ম"ছব, উৎসব ও ইউফোরিয়ার মুখে ড. ইউনহ্স যখন আত্মসন্তোষের দশ ফুট উঁচায় উঠে গেছেন, তখন তাকে প্রাচীনকালের একটি গল্পকল্প সবিনয়ে জানাব। প্রাচীনকালে গ্রিক অথবা রোমক সেনাপতিরা যখন দিগ্বিজয় করে স্বদেশে ফিরতেন এবং চারদিকে আনন্দ, উৎসব, অভ্যর্থনার ঘটা চলছে, তখন বিজয়ী সেনাপতি যেন অহঙ্কারে দশ ফুট স্ফীত হয়ে না ওঠেন সে জন্য একজন সাধারণ সৈনিককে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে পাশে রাখতেন। সে সেনাপতিকে অনবরত শুধু বলতে থাকত, মবহবৎধষ, ুড়ঁ ধৎব ধ সড়ৎঃধষ (জেনারেল, আপনারও মৃত্যু আছে।) আমি কারো মৃত্যুর কথা ভাবি না, শুধু আশঙ্কার সঙ্গে ভাবি, ড. ইউনহ্সও নিজের অহঙ্কারের বশেই নিজের এবং দেশের বড় ক্ষতি না করেন।

(দৈনিক সমকালে প্রকাশিত)